সাম্যবাদ

রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের আন্দোলনের আংশিক বিজয় ৪ | রংপুরে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন' এর বিক্ষোভ ৫ | বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত ৬ | অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, বিপর্যস্ত জনজীবন ৮

web: www.spbm.org | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, এপ্রিল-মে,২০২২ | মূল্য ৫ টাকা

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশেষায়িত প্রতিরক্ষা চুক্তির (জিসোমিয়া ও আকসা) আলোচনায় গভীর উদ্বেগ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা এক বিবৃতিতে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত অষ্টম নিরাপত্তা সংলাপে উচ্চ প্রযুক্তির সমরাস্ত্র কেনার লক্ষ্যে দুইটি বিশেষায়িত প্রতিরক্ষা চুক্তির (জিসোমিয়া ও আকসা) আলোচনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এর তীব্র বিরোধীতা করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন,"আমেরিকার সাথে অস্ত্রবিষয়ক গোপন তথ্য বিনিময় ও সুরক্ষার চুক্তি 'জিসোমিয়া (জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট) ও অস্ত্র কেনাকাটা বিষয়ক চুক্তি আকসা (অ্যাকুজিশান অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং এগ্রিমেন্ট) চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য মহা হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি আকসা ও জিসোমিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সাল থেকে বাস্তবে এ অঞ্চলে তার সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের সাথে আলোচনা চালিয়ে আসছে। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক এলাকা। ফলে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির কারণে যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি জোরদার করার কথা বলে এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারলে ভবিষ্যতে তা বাংলাদেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত ন্যাটো কিংবা তার কোয়ালিশন পার্টনারদের সঙ্গে ইতোপূর্বে আকসা চুক্তি সম্পাদন করেছে। স্বভাবতই বাংলাদেশের সাথে চুক্তিটি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার আশংকা থাকে। জিসোমিয়া চুক্তিভুক্ত দেশের মধ্যে সামরিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের বাধ্যবাধকতা জেনে ইতিমধ্যে এই চুক্তির তীব্র বিরোধীতা করেছেন দেশের সামরিক ও পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা চুক্তির সাথে সংযুক্ত শর্তের প্রতি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেও তা উপেক্ষা করে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য মার্কিন অনুদান অব্যাহত রাখতে ও র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে সরকার মরিয়া হয়ে এ চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে।"

তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকেন্দ্রিক অপতৎপরতা ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

পরিষেবাখাতের মূল্যবৃদ্ধি কেন?

দ্রব্যমূল্যের সাথে সাথে সেবাখাতগুলোর দাম বাড়ানো হচ্ছে। গত ১১ বছরে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৯০%, গ্যাসের দাম বেড়েছে ১৪৪% ও পানির দাম বেড়েছে ২৬৪%। লোকসানের কথা বলেই সবসময় দাম বাড়ানো হয়। এটা পরিকল্পিত লোকসান। পরিকল্পিতভাবে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোকসানে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে চলতে একসময় এই খাতগুলোকে বেসরকারি খাতে পরিণত করা হবে। পাটকলের মতোই আগামীতে বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে সেবাখাতগুলোকে তুলে দেয়া হবে। নব্য উদারিকরণ অর্থনীতির এটাই নিয়ম, এই পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ। আগামীতে দেশের মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সুপেয় পানি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সরকার নেবে না।

কুইক রেন্টালের স্পর্শে কুইক মূল্যবৃদ্ধি

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন গ্রীষ্মকালে পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিলো ৭০০ থেকে ৯০০ মেগাওয়াট। পিডিবি'র জেনারেশন রিপোর্ট অনুসারে ২০০৯ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখে ঘাটতি ছিল প্রায় ৭০০ মেগাওয়াটের মতো। একই রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, ওইদিন গ্যাস সংকটের কারণে ৩৪২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম উৎপাদিত হয় আর বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন ত্রুটি ও মেরামতকর্মের জন্য ৭০৭ মেগাওয়াট কম উৎপাদিত হয়। (সূত্র: 'বাংলাদেশে উন্নয়নের অর্থনীতি', লেখক– কল্লোল মোস্তফা)

অর্থাৎ দেশের সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ত্রুটি মেরামত করলে ৭০০ মেগাওয়াটের ঘাটতিটা আর থাকে না। এটা একটা দিনের কথা নয়। ঘাটতির হিসেবটা সেসময়ে ● ২ এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার স্বার্থে?

আবার বেড়েছে গ্যাসের দাম। এলপিজি গ্যাস কেজি প্রতি দাম বেড়েছে ৪.০৬ টাকা (মূসকসহ)। বাসা-বাড়িতে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এক চুলার ক্ষেত্রে ৬৫ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ১০৫ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি মানে শুধু গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নয়, বরং গাড়ি ভাড়া, বাড়ি ভাড়াসহ জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়া। এই অসহনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময়ে কেন গ্যাসের দাম আবার বাড়ানো হচ্ছে? গ্যাসের এই মূল্যবৃদ্ধি কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে কার স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে?

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নয়, বরং মূল্য কমানো যায়

বাংলাদেশে প্রতিদিন ৩ হাজার ৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস লাগে। ● ২ এর পাতায় দেখুন

পানির দরে পানি পাওয়া যাবে না

বর্তমান সরকারের ১৩ বছরের শাসনামলে পানির দাম বেছেড়ে ৩'শ শতাংশ। মোট ১৪ বার পানির দাম বাড়ানোর পরও, পুনরায় আবার ২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি মানে কতটুকু বৃদ্ধি? ঢাকা ওয়াসা পানি ও সুয়ারেজ বিল একইসাথে আদায় করে। তাই পানির মূল্যবৃদ্ধি মানে সুয়ারেজ বিল বৃদ্ধি। আর এই মোট বিলের ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। তাই পানির ২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি মানে ভোক্তাপর্যায়ে বাড়বে ৪৬ শতাংশ (২০%পানি+২০%সুয়ারেজ+৬% ভ্যাট)। অর্থাৎ ১০০ টাকার বিল হবে ২৪৬ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের মাত্র ১৫ শতাংশ এলাকায় সুয়ারেজ সুবিধা আছে, কিন্তু এই বিল আদায় করা হয় সবার কাছ থেকে। ওয়াসা প্রকল্প ঋণ শোধ করতে হয়, ● ২ এর পাতায় দেখুন

বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কমরেড মাসুদ রানা সমন্বয়ক নির্বাচিত

বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন ১৭, ১৮ ও ১৯ মার্চ বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মানস নন্দীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মাসুদ রানার পরিচালনায় সম্মেলনে পার্টির সদস্য ও আবেদনকারী সদস্যগণ তিনদিন ব্যাপী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমরেড মাসুদ রানাকে সমন্বয়ক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের ● ২ এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে মানুষের ব্যাপক সমর্থনে বামজোটের হরতাল পালিত

হরতালের প্রচারকার্যে ও হরতালের দিনে জেলায় জেলায় বাধা, হামলা ও গ্রেফতার

অব্যাহতভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের কষ্টের যখন কোন সীমা-পরিসীমা নেই, মানুষ যখন একটা জোরালো প্রতিবাদ চাইছেন–তখন বামজোটের হরতালের ঘোষণা যেন মানুষের ক্ষুব্ধতাকে ভাষা দিয়েছে। সারাদেশে হরতালের প্রচার-প্রচারণায় মানুষ অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে। রাস্তায় মিছিলের সময়, প্রচারপত্র বিলি করার সময় শ্রমজীবী মানুষ যুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে হরতালের প্রচারণার সময় স্থানে স্থানে বামজোটের নেতাকর্মীদের উপর হামলা হয়েছে। চট্টগ্রামে প্রচারের পিক আপ ভ্যান ভাঙচুর করা হয়েছে, পিক আপের ● ২ এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে মানুষের ব্যাপক সমর্থনে

উপর থাকা বামজোটের নেতাকর্মীদের মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে। হামলা হয়েছে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার চলাকালে ছাত্রনেতাদের উপর ছাত্রলীগ হামলা করেছে। ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় পথসভায় বাধা প্রদান, মাইক কেড়ে নেয়া হয়েছে। হরতালের আগের দিন গাইবান্ধায় প্রচার মিছিলে লাঠিচার্জ করা হয় বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের নেতা ও গাইবান্ধা জেলা শাখার সদস্য কমরেড নিলুফার ইয়াছমিন শিল্পীসহ ৩ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

হরতালের দিন সাধারণ জনগণ তাদের সাময়িক অসুবিধা মেনে নিয়েই হরতাল পালনে সহায়তা করেছে। কিন্তু ভোর ৬টা থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল সমাবেশ করতে চাইলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বাধা দেয়। ঢাকার পল্টনের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও জলকামান, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে। এতে জোটের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতা কর্মী আহত হন। খুলনায় রাতের অন্ধকারে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জে মিছিলে পুলিশ উপর্যুপরি হামলা ও লাঠিচার্জ করেছে। এছাড়াও ঢাকার মিরপুর, ময়মনসিংহ, ফেনী, সিলেটসহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বামজোটের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেছে। কিন্তু জনগণ স্বতঃস্ফর্তভাবে এই হরতাল পালন করেছে।

বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিশেষ

সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড সীমা দত্ত, শফিউদ্দিন কবির আবিদ, মাসুদ রেজা, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য, তাসলিমা আক্তার বিউটি, আসমা আক্তার, আহসানুল আরেফিন তিতু, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা, রাশেদ শাহরিয়ার, রাজু আহমেদ ও বিটুল তালুকদার। তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে বিভিন্ন দিক থেকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এটা নতুন করে বলার কিছু নেই যে, দেশের জনগণ আজ এক ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছেন। চাল-ডাল-তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ সরকার ক্রমাগত গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করছে। সেবাখাতসমূহ থেকে ভর্তুকি উঠিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ হ্রাস করলেও বড় বড় অবকাঠামোগত 'উন্নয়নে'র প্রকল্প গ্রহণ করছে। উন্নয়নের নামে চলছে লুটপাট। একদিকে দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে অন্যদিকে দেশে বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা। ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বৈষম্য ও দেশের জনগণের দুর্দশার মূল কারণ পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা।

মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থেই শাসকদল আওয়ামী লীগ সমস্ত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করার লক্ষেই যাবতীয় পরিকল্পনা করা হচ্ছে। দেশের মানুষের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ গায়ের জোরে অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন হয়ে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন কায়েম করেছে। ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ একের পর এক কালা-কানুন প্রণয়ন করছে। বুর্জোয়া শাসনের ফলশ্রুতিতে দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ জনসাধারণ পিষ্ট হলেও দেশে বিদ্যমান বামশক্তির আদর্শগত বিভ্রান্তি ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী কোন গণআন্দোলন অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় দেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও জনজীবনের সংকট নিরসনে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও দেশে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ বিপ্লবী দল গড়ে প্রত্যয় ঘোষিত হয় সম্মেলনে। দেশের জনসাধারণকে সেই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

পানির দরে পানি পাওয়া যাবে না

সুদ দিতে হয়। অন্য সকল ক্ষেত্রের মতোই তাদের প্রকল্পেও দুর্নীতি, প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়ের ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে অনেক বেড়ে যাওয়া, প্রকল্পের সময় দীর্ঘায়িত করা–এই চিত্রগুলো স্বাভাবিকভাবে ছিল, যার খেসারত দিতে হচ্ছে জনগণকে। পদ্মা প্রকল্পে চীনের কাছ থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার পানি পাওয়ার কথা, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৫ লাখ লিটার। আর ভাকুর্তা থেকে যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা তা থেকে এক চতুর্থাংশও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সুদ ঠিকই গুণতে হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এডিবি, ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক। ফলে বাড়ছে ঋণের বোঝা। আর এই বোঝা মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

পত্রিকায় খবর এসেছে 'সিস্টেম লস'-এর নামে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী যে দুর্নীতি করেন, তা প্রতিরোধ করতে পারলে এই কথিত ভর্তুকিই লাগতোনা। ওয়াসার ১১টি ক্ষেত্রে দুদক দুর্নীতির কথা বলেছে, কিন্তু কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

বিভিন্ন পত্রিকায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়াসার একাধিক কর্মকর্তাই বলেছেন 'ভর্তুকি'র যে হিসাব দেয়া হয় তা যথাযথ নয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ঢাকা ওয়াসার সঞ্চিত মুনাফা ৮৯২ কোটি টাকা। গত ৫ বছরে তাদের মুনাফা বেড়েছে ১১৯ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এই ঢাকা ওয়াসা প্রতিবছর লাভ হয় বলে কর্মকর্তারা বছরে ৪টি উৎসব বোনাস গ্রহণ করেন। কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে মূল্যবৃদ্ধি করা আইনসম্মত নয়। তারপরও প্রতিবছর দাম বাড়ানো হয়। যুক্তি একটাই ভর্তুকি প্রদান।

ঢাকা ওয়াসা সাধারণত পানির মূল্যবৃদ্ধির জন্য দুটি যুক্তি তুলে ধরে। একটি ঢাকায় প্রতি ইউনিট পানির দাম লন্ডন, সিঙ্গাপুরসহ উন্নত শহরগুলির চেয়ে কম। আর অন্যটি, ওয়াসা একটি সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, তারা সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষা (ভর্তুকি) করে চলতে পারে না।

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় গ্যাটস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে পানিসহ ১৬১টি পরিষেবা খাতকে ছেড়ে দিতে হবে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের হাতে। রাষ্ট্রের হাত থেকে সকল দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেয়ার পোশাকি নাম 'নব্য উদারিকরণবাদ'। এ জন্যই ওয়াসা আওয়াজ তুলেছে,"সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষা (ভর্তুকি) করে চলতে পারে না।" শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে গোটা পানিখাতকে ব্যবসায়িক বা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেয়ার আয়োজন চলছে। এর অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াসাসহ পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সায়ত্তশাসিত কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জনগণকে সুপেয় পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করছে।

কুইক রেন্টালের স্পর্শে কুইক

গড়ে এইরকমই ছিলো। অর্থাৎ সরকারি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে মেরামত ও আধুনিক করলে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন নেই। পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্র একই পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিয়েই পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

কিন্তু সেটা করা হলো না। বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ হিসেবে গ্যাসের ঘাটতির কথাই বারবার সামনে আনা হলো এবং সেজন্য বেসরকারি মালিকানায় তেলভিত্তিক কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হলো। তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ, গ্যাস থেকে উৎপাদনের খরচের ৬ থেকে ৮ গুণ বেশি। উপরন্তু এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ব্যক্তিমালিকানায় স্থাপন করা হলো। এই কুইক রেন্টাল বিদ্যুতকেন্দ্রের উৎপন্ন বিদ্যুতের ক্রয়মূল্য 'এনার্জি প্রাইস' ও 'রেন্টাল প্রাইস' এই দুইভাগে বিভক্ত। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরকার এনার্জি প্রাইস দিয়ে কিনে নেবে। বিদ্যুৎ কম উৎপাদিত হলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিক এনার্জি প্রাইস কম পাবেন, কিন্তু রেন্টাল প্রাইস সরকারকে প্রতিমাসে পরিশোধ করতে হবে এবং সেটা এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ না কিনলেও। অর্থাৎ কোন কেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা যদি ৫০ মেগাওয়াট হয়, তাহলে ওই মালিককে প্রতিমাসে কিলোওয়াট প্রতি ১৫.৯ ডলার ভাড়া দিতে হবে। এর ফলাফল হলো তিন বছরের মাথায় ২০১২ সালে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে পিডিবি'র দাম বাড়ানোর প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়,"তরল জ্বালানীর ব্যবহার, বেসরকারি খাত হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং জ্বালানী ব্যয়ের অংশবৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।" এরপর গত ১১ বছরে ১০ বার বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা হলো। এই ১১ বছরে গ্রাহক পর্যায়ে প্রায় ৯০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।

অথচ বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্রই পুরনো যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলছে। সেগুলো মেরামত করলে গ্যাসের দুষ্প্রাপ্যতার ব্যাপারটা আসতো না। যে সরবরাহ এখন আছে তা দিয়েই বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো যেতো। আবার গ্যাসের অভাব নিয়ে যা বলা হচ্ছে তাও সঠিক নয়। গ্যাস সম্পর্কিত আমাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র সন্ধান না করাসহ পেট্রোবাংলাকে অকার্যকর করে দিয়ে কিভাবে গ্যাস সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বাইরে আছে গ্যাসের অপচয় ও সিস্টেম লস। গৃহস্থালী গ্যাসে খুব অল্প জায়গায় মিটার ব্যবহার করা হয়, মিটার না থাকায় গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত গ্যাসের একটা বড় অংশই অপচয় হয়। আবার আমাদের শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত সেকেলে বয়লারও অপচয়ের একটা বড় কারণ। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী সার কারখানায় এক মেট্রিকটন ইউরিয়া সার উৎপাদন করতে খরচ হয় ২৪ হাজার ঘনফুট গ্যাস। একই পরিমাণ সার উৎপাদন করতে সরকারি যমুনা সার কারখানায় লাগে ৩২ হাজার ঘনফুট, চিটাগাং সার কারখানায় ৪২ হাজার ঘনফুট, ঘোড়াশালে ৪২ থেকে ৪৯ হাজার ঘনফুট, আশুগঞ্জে ৭৩ হাজার ঘনফুট আর ফেঞ্চুগঞ্জে ৮২ হাজার ঘনফুট গ্যাস। অর্থাৎ যে পরিমাণ গ্যাস অপচয় হয় তা রীতিমত আতংকের। তাই নতুন কূপ অনুসন্ধান ও সিস্টেম লস কমিয়ে আনলে গ্যাস সংকট সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়।

তা না করে সরকার আবার 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) বিল-২০২১' সংসদে পাস করায়, যাতে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো আরও পাঁচ বছর চালানোর আইনি স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে তেলভিত্তিক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা সংসদেও কথা উঠেছে। এ কারণে এগুলো টেকসই নয় স্বীকার করে সরকার যে পরিকল্পনার দিকে হাঁটছেন, সেটাও সংকট সমাধান করবেনা, নতুন সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া। সরকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করছেন, তার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে মেগা প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের খরচ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আড়াই-তিনগুণ বেশি। উপরন্তু এর পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাপক। রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়েছে ও হচ্ছে। বাংলাদেশের ফুসফুস সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে। তারপরও জনমতকে উপেক্ষা ও দমন করে সরকার এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই শখ করে লোকসান কেন? তার দায় আবার জনগণের কাঁধে চাপানো কেন? কেন পরিবেশ-প্রকৃতি ধ্বংস করা, যেখানে পুরনো গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরিত করে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি বাড়ালে বর্তমানের অর্ধেক জ্বালানী ব্যবহার করে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব?

এর উত্তর একটিই। বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। তারা এগুলো ফেলে রাখলেও টাকা পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। আর লোকসান দেখাতে দেখাতে ধীরে ধীরে গোটা বিদ্যুৎখাতই এদের হাতে তুলে দেয়া হবে। এ লক্ষ্যেই চলছে সমগ্র আয়োজন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার স্বার্থে?

এর মধ্যে ২৩'শ ঘনফুট গ্যাস নিজেরাই সরবরাহ করতে পারে। আর আমদানি করতে হয় ৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। আমদানিকৃত গ্যাসের মধ্যে ৬শ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আনা হয় দীর্ঘমেয়াদী (১০বছর) চুক্তিতে। যার সর্বোচ্চ দাম পড়ে ৬-১০ ডলার। আর খোলা বাজার থেকে আনতে হয় মাত্র ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস, যার দাম উঠানামা করে। এই অল্প পরিমাণ গ্যাসের জন্য এতো ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

বাংলাদেশে 'সিস্টেম লস' এর নামে ১২ শতাংশ গ্যাসের অপব্যয় হয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যা মাত্র ২ শতাংশ। বাস্তবে এই 'সিস্টেম লস' হলো চুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে এই চুরি রোধ করতে পারলেও গ্যাস আমদানি করতে হতো না।

আমদানিকৃত গ্যাসের দাম বাড়লে দেশে গ্যাসের দাম বাড়ছে। কারণ পেট্রোবাংলার হিসাব মতে, গ্যাস উৎপাদনে দেশীয় কোম্পানির খরচ হয় ১ টাকা ২৭ পয়সা, দেশী গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিদেশী কোম্পানি গ্যাস উৎপাদনে খরচ হয় ২ টাকা ৯১ পয়সা। আর আমদানি করলে ইউনিট প্রতি খরচ পড়ে ৫০ টাকা ৩৯ পয়সা। আমদানি করতে হয় এলএনজি'র মাধ্যমে। আবার নিজের দেশে গ্যাস থাকার পরও উত্তোলন ও অনুসন্ধান না করে বিদেশি কোম্পানির সাথে অসম 'প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি)' করার কারণেও গ্যাসের দাম বাড়ে। আমদানিকৃত গ্যাস খুব অল্প, তারপরও বিশ্ববাজারে দামবৃদ্ধির কথা বলে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়। আবার বিশ্ববাজারে দরপতনের সময়েও গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়। ২০১৯ সালে, যখন বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম কমেছে শতকরা ৫০ ভাগ, ভারত তাদের ভোক্তাদের জন্য গ্যাসের দাম কমিয়েছে ১০১ রূপী, তখনও বাংলাদেশে ৪৬.৭৫ শতাংশ হারে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে।

দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সের সক্ষমতা না বাড়িয়ে বেশি মূল্যে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। স্বনির্ভর জ্বালানী খাতের পরিবর্তে আমদানিনির্ভর জ্বালানিখাত সৃষ্টি করা হচ্ছে। নব্য উদারকরণ নীতিমালায় এই খাতগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগ উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে, এক সম্ভাব্য জ্বালানী সংকটের দিকে দেশকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এতে কারা লাভবান হচ্ছেন? মহেশখালী সমুদ্র বন্দরের ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের দায়িত্বে আছে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জি আর দেশীয় কোম্পানি সামিট। দক্ষিণাঞ্চলের পায়রা এলাকায় এরা আরেকটি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা হচ্ছে। মাতারবাড়ি এলাকায় স্থলভাগে টার্মিনাল নির্মাণের কথা বলছে সামিটসহ আরও ১৫টি বিদেশী কোম্পানি। ভারত থেকে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ভারতীয় কোম্পানি এইচ-এনার্জি। সামিট গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার আওয়ামী লীগ সরকারের প্রাক্তণ বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান। বর্তমান জ্বালানী নীতি থেকে দেশ পরিচালনাকারী বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের কোলাবোরেশন যে প্রভূত মুনাফায় স্ফীত হচ্ছে সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও আধিপত্য বিস্তারের লড়াই

বুঝতে সাহায্য হবে।

রাশিয়া ও ন্যাটো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organisation-NATO) সামরিক জোট গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এই জোটের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রভাবে ইউরোপের বাকী অংশে সমাজতন্ত্রের বিস্তারের সম্ভাবনা সামরিক পন্থায় রোধ করা। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর নিরাপত্তা সম্মিলিত ন্যাটো বাহিনী দেখবে, যুদ্ধে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে, সদস্য দেশগুলোতে ন্যাটো বাহিনীর ঘাঁটি-সৈন্য-অস্ত্রসম্ভার সবসময় মোতায়েন থাকবে। এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য ১৯৫৪ সালে ওয়ারশ সামরিক জোট গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে, ওয়ারশ জোটও বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই ন্যাটো জোটেরও অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকার কথা নয়। কিন্তু ন্যাটো জোট টিকে থাকে, বরং একে আরো শক্তিশালী করা হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকেও একে একে ন্যাটোর সদস্য করা হয়। অথচ দুই জার্মানীর একত্রীকরণের সময় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়াকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'পূর্ব দিকে ন্যাটোর সীমানা এক ইঞ্চিও বাড়ানো হবে না'। রাশিয়া ন্যাটোতে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করলেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। বিপরীতে, কাছাকাছি দেশগুলোতে শত্রুভাবাপন্ন ন্যাটো জোটের সামরিক স্থাপনা-ঘাঁটি-অস্ত্রসম্ভার রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তারা বিবেচনা করে। বিশেষ করে, পাশের দেশ ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে চাইলে রাশিয়া তা মেনে নিতে চায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব ইউরোপের ওপর দিয়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মানীর হিটলার বাহিনীর বিধ্বংসী আক্রমণে ২ কোটি ৭০ লক্ষ সোভিয়েত প্রাণহানি; তার আগে ফ্রান্স থেকে এ পথে এসে নেপোলিয়ন বাহিনীর রাশিয়া আগ্রাসনে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতি রাশিয়ার জনমনে স্বাভাবিকভাবেই দাগ কেটে আছে। এই প্রেক্ষাপট কাজে লাগিয়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার ইউক্রেন আক্রমণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি যুক্তি করেছেন – 'পাশের দেশ মেক্সিকোয় রাশিয়া সামরিক ঘাঁটি ও ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করতে চাইলে আমেরিকা কি তা মেনে নেবে'? তাদের কথা হলো, আমেরিকার মনরো ডকট্রিন যেমন বলে, "বাইরের কোনো শক্তি পশ্চিম গোলার্ধে অর্থাৎ উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকায় এমন কিছু করতে পারবে না, যা তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়", রাশিয়াও একই কথা বার বার বলেছে কিন্তু আমেরিকা কিংবা ন্যাটো তা কানেও তুলেনি।

প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো ক্রমবর্ধমানভাবে আক্রমণাত্মক সামরিক জোটের ভূমিকা নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'একমেরু বিশ্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে ন্যাটোকে কাজে লাগায়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও বজায় রাখতে মার্কিনীরা তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবহার করে। একাজে তার বিশ্বস্ত সহযোগী হল অনুগত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, অন্যদিকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকলেও জার্মান-ফ্রান্স-ইতালিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়া লুটের ভাগ পাওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে হাত মেলায়। ন্যাটো জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে নানা অজুহাতে ১৯৯৯ সালে যুগোশ্লাভিয়া, ২০০১ সালে আফগানিস্তান, ২০০৩-এ ইরাক, ২০১১-এ লিবিয়া, ২০১৩ সালে সিরিয়ায় সামরিক আগ্রাসন-হামলা চালায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুর্বল হয়ে পড়া পুঁজিবাদী রাশিয়া এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে থাকলেও বাধা দিতে পারেনি বা চায়নি। এমনকি একটির পর একটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশকে ন্যাটোভুক্ত করার সময় রাশিয়ার প্রতিবাদ ও নিরাপত্তা উদ্বেগকে গ্রাহ্য করা হয়নি। এই সময়কালে পুতিনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী রাশিয়া কিছুটা গুছিয়ে ওঠে। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ জনশক্তি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রেখে যাওয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক অবকাঠামো কাজে লাগিয়ে তারা বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার দখলে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। এর লক্ষণ দেখা যায় সিরিয়ায় বন্ধুভাবাপন্ন আসাদ সরকার ও একমাত্র বৈদেশিক রুশ সামরিক ঘাঁটি রক্ষায় সামরিক সাহায্য পাঠানোর মধ্য দিয়ে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

২০১৪ সালে তৎকালীন রুশপন্থী ইয়ানুকোভিচ সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার সাথে ঋণচুক্তি করলে ওই সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের সূচনা হয়। অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত ইউক্রেনিয় জনসাধারণের অনেকে তখন মনে করেছিলো– ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে থাকলে ইউরোপের দেশগুলোতে বেকারদের কাজের সুযোগ বাড়বে, তাদের সাহায্যে অর্থনীতির উন্নতি হবে। এই গণবিক্ষোভের সুযোগে মার্কিনসহ ন্যাটো দেশগুলোর সরাসরি হস্তক্ষেপে এক সাজানো গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রুশপন্থী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিমাদের অনুগত ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করে। ইউক্রেনে রাশিয়ার প্রভাব কমাতে উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি ও নব্য-নাৎসীবাদী সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে সরাসরি মদদ দেয় পশ্চিমা দেশগুলো।

২০১৪ সালে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো কেন তা বুঝতে হলে আমাদের আরেকটু পেছনে যেতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত ইউক্রেন ও রাশিয়া ভেঙে আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যায়, ১৯৯১ সালে, যখন প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইউক্রেন পরিচালিত হতে থাকে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মহৎ পরামর্শে চলতে চলতে এককালের সমৃদ্ধ ইউক্রেন একটি দরিদ্র দেশে পরিণত হচ্ছিল দিন দিন। ইউক্রেনের নিজস্ব শিল্প ও কৃষিকে ধ্বংস করে পশ্চিমারা দেশটিকে তাদের উপর নির্ভর করে তুলছিলো। এটাই অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি।

এদিকে ভেঙে যাওয়া সোভিয়েতের অঙ্গরাজ্যগুলিকে যুক্ত করে পুঁজিবাদী রাশিয়া একদিকে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং অন্য দিকে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস (সিআইএস) গঠন করে এই রাজ্যগুলির উপর তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। কারণ সমাজতন্ত্র ছেড়ে দেয়ার পর পুঁজিবাদী রাশিয়া তার পুরানো শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিতটাকে ব্যবহার করে আমেরিকার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাজার দখলের লড়াইয়ে নামে। এর ফলে মার্কিন ও ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সাথে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব তীব্র হতে থাকে। কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থই নয়, আমেরিকার প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক স্বার্থও যুক্ত হয়েছিল। বর্তমান অর্থনীতিতে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববাজারে জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আমেরিকা সম্প্রতি রাশিয়াকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এসেছে। কিন্তু আমেরিকার গ্যাসের উৎপাদন এবং পরিবহন খরচ অনেক বেশি। জার্মানিসহ পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশে তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের বাজার তুলনামূলকভাবে সস্তা রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে জার্মানির আমেরিকাকে ইউরোপের বাজারে ঢুকতে না দেওয়ার মানসিকতাও যুক্ত হয়েছিল। আমেরিকা তার জ্বালানি গ্যাস উৎপাদক সংস্থাগুলির স্বার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যাসের বাজারে নানা কৌশলে ঢুকতে চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ লাইন ছিন্ন করা আমেরিকার অন্যতম লক্ষ্য। ইউক্রেনকে ন্যাটোর সাথে যুক্ত করার পিছনে আমেরিকার যে সমস্ত অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করছে, এটা তার অন্যতম। এ ছাড়া ইউক্রেনের ভৌগলিক অবস্থান সিআইএস রাষ্ট্রগুলির উপর রাশিয়ার সামরিক আধিপত্য খর্ব করা এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপর আমেরিকার সামরিক-রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

আমেরিকার ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

সিআইএ-কে ব্যবহার করে আমেরিকা বিভিন্ন দেশে তার ষড়যন্ত্রের রাজনীতি কিভাবে বাস্তবায়ন তার ব্যাখ্যা করার নিষ্প্রোয়জন। ইউক্রেনকে কেন্দ্র করেও এই চক্রান্ত সে শুরু করে। ইউক্রেনের রুশবিরোধী ভূমিকার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউক্রেনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো হিটলারকে সাহায্য করেছিলো। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে সেই পুরনো ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্তরসূরিরা ইউক্রেনে এখনও আছে। তাই জর্জিয়াকে দিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যা পারেনি তা ইউক্রেনকে দিয়ে বাস্তবায়নের চিন্তা করল। একের পর এক ঘটনায় ইউক্রেনের শাসককূলের মধ্যে রাশিয়াবিরোধী শক্তির সমাবেশ বাড়তে থাকলো।

একইসাথে আমেরিকা অন্যান্য প্রাক্তন সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যগুলিতেও তার গুপ্তচর বাহিনী সিআইএ-কে হাতিয়ার করে রুশবিরোধী উপজাতীয় মানসিকতা এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে জাতিদাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার কাজটিও চালাতে থাকে। ইউক্রেনের ভেতরের রুশবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে উস্কানি দিয়ে ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করার জন্য ইউক্রেনিয় রাজনীতিবিদদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ২০০৪ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ইউনুকোভিচ ভোটে জেতেন, কিন্তু ভিক্টর ইউশেঙ্ককোর সমর্থক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সরাসরি অর্থ সাহায্যে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে বিপুল গণবিক্ষোভ, অসহযোগিতা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে (কথিত অরেঞ্জ বিপ্লব) সরকারকে বাধ্য করে নতুন করে নির্বাচন দিতে। তাতে ভিক্টর ইউশেঙ্ককো জয়ী হন। এতে পশ্চিম ইউক্রেনের রুশবিরোধী উগ্রজাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। যুবপ্রজন্মের মধ্যে রুশবিরোধী মনোভাব ছড়াতে থাকে। ২০০৪ সালে উগ্রবাদীদের কাঁধে চড়ে ক্ষমতার আসা এককালের কমিউনিস্ট নেতা ভিক্টর ইউশেঙ্ককো প্রাক্তন নাৎসি কোলাবরেটর স্তেপান বান্দেরাকে জাতীয় বীর আখ্যা দেয় এবং তার স্মারক ডাক টিকেট বের করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্তেপান বান্দেরার 'ইউক্রাইনিয়ান ন্যাশনালিস্ট অর্গানাইজেশন'পশ্চিম ইউক্রেনে কয়েক লাখ ইহুদি, পোলিশ, ইউক্রেনিয়ান ও রাশিয়ানকে হত্যা করেছিলো।

২০১৪ সালে জনগণের ভোটেই আবার নির্বাচিত হয়ে আসেন ভিক্টর ইউনুকোভিচ। কিন্তু ২০০৪ সালে রিহার্সাল দেওয়া 'অরেঞ্জ বিপ্লব'র কুশীলবরা আবার মাঠে নামে। এবার এরা আরও শক্তিশালী, সংহত ও হিংস্র। তাদের সঙ্গে হাত মেলায় ইউক্রেনের বৃহৎ পুঁজিপতিরা। কূটনীতির নিয়ম ভঙ্গ করে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তারাও এতে যোগ দেন।

দেশে মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা ইউনুকোভিচের সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মধ্যস্থতার পদক্ষেপ নেয়। সরকার সেটা মেনে নেয়। ২১ ফেব্রুয়ারিতে পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যস্থতায় ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভিক্টর ইউনুকোভিচ ও বিরোধীদলগুলো চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু তার একদিনের মধ্যেই সশস্ত্র উগ্রবাদীরা পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট ভবনে আক্রমণ চালায়, প্রেসিডেন্ট ও তার পক্ষের এমপিরা জীবন নিয়ে পালায়। পার্লামেন্ট ভোটাভুটি করে ইউনুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করে। নতুন সংসদ তৈরি হয়, প্রেসিডেন্ট হন পেট্রো পোরোশেঙ্কো।

উগ্রজাতীয়তাবাদী, ফ্যাসিবাদী, নাৎসী ইউক্রেন সরকারের নৃশংসতা

ক্ষমতায় আসে তিন পার্টির কোয়ালিশন। তাদের ২টি ন্যাটোমুখী জাতীয়তাবাদী ও কট্টর রুশবিরোধী, তৃতীয়টি ফ্রিডম পার্টি নামের উগ্রজাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট পার্টি। তারা এথনিক রুশদের অধিকার খর্ব করার আইন পাশ করে রুশভাষাকে একটি আঞ্চলিক ও সংখ্যালঘু ভাষা ঘোষণা করে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষার স্ট্যাটাস থেকে খারিজ করে দেয়। শুধু তাই নয় পূর্ব ইউক্রেনের এথনিক রুশ জনগণ যেহেতু মাইদানে অংশগ্রহণ করে নাই, তারা উগ্র জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণের শিকার হতে থাকে। ওডেসায় ৪০ জন এথনিক রাশিয়ানকে একটি দালানে বন্দি করে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়। ইউক্রেনে, পুরনো সোভিয়েত আমলের সমস্ত স্থাপত্য ভাঙা শুরু হয়। বিবিসি, সিএনএন বারবার করে সম্প্রচার করতে শুরু করে কিভাবে লেনিনের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া যেটা দেখায়নি, সেটা হচ্ছে, হাজার হাজার রুশ ভাষীদের তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যান করা হচ্ছে, তাদের কর্মীদের খুন করা হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের তাদের মিটিং চলাকালীন জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই নাৎসিবাদীদের হাত ধরেই ক্ষমতায় আসেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

এই অবস্থায় ইউক্রেনের রুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলে ডোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নামের দুটি এলাকার জনগণ নতুন ইউক্রেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে ওই অঞ্চল দখল করতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে বেসামরিক জনপদে বোমাবর্ষণ ও অবরোধ এখন পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেন। ২০১৫ সালে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ইউক্রেন ও রাশিয়া মিনস্ক-২ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর শর্ত ছিল– ওই অঞ্চলকে ইউক্রেনের অধীনে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়া হবে, সেখানে নির্বাচন আয়োজন করে তাদের নিজেদের সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান করা হবে। এর বিনিময়ে রাশিয়া বিদ্রোহীদের সমর্থন দান বন্ধ করবে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রসমর্পণ করবে। কিন্তু ইউক্রেন সরকার ওই চুক্তি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেনি, বরং পশ্চিমাদের সহায়তায় ওই অঞ্চলকে পদানত করার চেষ্টা করছে। ফলে গত ৭ বছর ধরে সেখানে যুদ্ধ চলছে। জাতিসংঘের হিসাবে এ পর্যন্ত ১৫ হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ডোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সরকারের আবেদনক্রমে রাশিয়া গত ২১ ফেব্রুয়ারি তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

রাশিয়ার আক্রমণও আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

ইউক্রেনের শাসকদের প্রকৃত চরিত্র, সাম্রাজ্যবাদী মদদে সৃষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদ ও রুশবিরোধী মনোভাব, ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে রাশিয়ার নাকের ডগায় আমেরিকান সেনাঘাঁটি স্থাপনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পরেও এ কথা ভাবা ভুল যে, পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণ শুধু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী পরিকল্পনার জবাব দেয়ার জন্য। এর পেছনে রাশিয়ার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও কাজ করেছে। রাশিয়ার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ইউরোপের বাজার চায়। কৃষ্ণসাগরের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চায়। তুরস্ক হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত পুরো স্থলভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ কব্জা করতে চায়। তেল-গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পুঁজিপতিদের মুনাফার জাল কম বিস্তৃত নয়। এসব কিছুকে কেন্দ্র করেই মার্কিন-রুশ দ্বন্দ্ব আজ দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্বের রূপে দেখা দিয়ে যুদ্ধের জন্ম দিল।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির রক্ষক হিসাবে আক্রান্ত দুর্বল দেশগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের শক্তি যুগিয়েছে। মহান নেতা স্ট্যালিন কখনওই আগ্রাসনের যুদ্ধ করেননি। তিনি সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য জনযুদ্ধ পরিচালনা করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন। সে সময়ের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষই মহান স্ট্যালিনকে মানবতার রক্ষাকর্তা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন পরবর্তী সংশোধনবাদী সোভিয়েত নেতৃত্ব ক্রমশ আমেরিকার পরমাণু যুদ্ধের হুমকির কাছে নতিস্বীকার করেছে। ফলে তাদের শান্তিরক্ষকের ভূমিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, তারা আমেরিকার মতোই ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে এরপর ৬ পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের আন্দোলনের আংশিক বিজয়

রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে শার্ট সেলাই মজুরি ২ টাকা, কাটিং রেট ৫০ পয়সা, গেঞ্জি সেলাই মজুরি ৫০ পয়সা বাড়াতে বাধ্য হলো মালিকপক্ষ। দর্জি শ্রমিকরা জানুয়ারি মাস থেকে মজুরি বৃদ্ধিসহ ৮ দফা দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। গত ১৫ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দেয় দর্জি শ্রমিকরা। সফলভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের দিন মালিকপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন শ্রমিকদের দাবি মানার আশ্বাস দিলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে শ্রমিকরা। কিন্তু দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। পরবর্তীতে ধর্মঘটের পরের দিন মালিক সমিতি, মালিক, শ্রমিক ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্বের বৈঠকে মজুরি বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের আহবায়ক ইউনুস আহমেদ, আক্কাস আলী, ইদ্রিস ও দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের উপদেষ্টা মাসুদ রানা, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক, ঢাকা নগরের সদস্য সচিব মানিক হোসেন, সদস্য ভজন বিশ্বাস প্রমুখ।

রেডিমেইড দর্জি শ্রমিকদের সংগঠন 'রেডিমেইড দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন' এর নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের দর্জি শ্রমিকরা লড়াই করছে। এর আগে ২০১৬ সালে আন্দোলনের চাপে একবার মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এবারও আবার আন্দোলনে নেমে দাবি আদায় করলো দর্জি শ্রমিকরা।

গাইবান্ধায় হতদরিদ্রদের টাকা আত্মসাৎ প্রতিবাদে আন্দোলন

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী, মালিবাড়ী ও লক্ষীপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র গরীব মানুষকে সরকারি ঘর, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, যত্নপ্রকল্পে পুষ্টিভাতা, গর্ভবতীভাতা, শিক্ষাভাতা, কর্মসৃজন, রেশন ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পের টাকা দেয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন উপজেলা পরিষদের পিওন নুরু ও মুক্তি আর তাদের সহযোগীরা। এই গরীব মানুষ জানেন এই প্রকল্পগুলো তাদের মতো হতদরিদ্রদের জন্য হলেও তাদের হাতে প্রকল্পের টাকা আসে না। সরকারি সাহায্য পেতে হতদরিদ্রকেও ঘুষ দিতে হয়। যেভাবেই হোক টাকা জোগাড় করতে হয়।

ঘটনাটা আরও বিষাদময় হয় যখন এই প্রতারক চক্র গরীব মানুষের এই লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দেয়। উপায়হীন এই মানুষগুলো উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা। হতদরিদ্রদের নিয়ে গণকমিটি গঠন করে আন্দোলন চলছে।

শহিদ রুমী ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য, একাত্তরের সাহসী সন্তান। রুমী ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে, তরুণ প্রজন্মের এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, নৈতিকতার সংকটের কালে শহিদ রুমীর চরিত্র তাদের অনুসরন করা দরকার। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের কাছে রুমীর জীবন তুলে ধরা ও তাদের রুমী হতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ঢাকা কলেজের কিছু তরুণ ছাত্র গড়ে তুলেছে শহিদ রুমী সংসদ। ১৩ এপ্রিল ঢাকা কলেজের মাঠে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র মশিউর রহমানকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট রুমী সংসদ গঠিত হয়।

সুনামগঞ্জের হাওরে পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার বিক্ষোভ

পতেঙ্গা সি বিচ চট্টগ্রামবাসীর বিনোদনের একমাত্র উন্মুক্ত স্থান। নগরজীবনের ক্লান্তি কাটাতে সাধারণ মানুষ সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারী ছুটির দিনে বা যে কোন উৎসবের দিন ছুটে আসে পতেঙ্গা বিচে। অথচ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা সিডিএ সাধারণ মানুষের এ স্বস্তির জায়গাটুকু কেড়ে নিতে চায়। পতেঙ্গা সি বিচকে আন্তর্জাতিক মানের করার কথা বলে সিডিএ পতেঙ্গা সি বিচের ৬ কিলোমিটার ও ইপিজেড সাগরপাড়ের ৩৫ একর জায়গা দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইজারাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এখানে নিজেদের মতো করে বিনোদন কেন্দ্র তৈরি, বিচের রক্ষণাবেক্ষন এবং বিচের বেশিরভাগ অংশে প্রবেশের জন্য টিকেটের দাম নির্ধারণ করতে পারবে। এর প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী)'র বিক্ষোভে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম জেলার সদস্য কমরেড শফিউদ্দিন কবির আবিদ।

বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মন্ডলের মুক্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের বিক্ষোভ

গত ৪ মার্চ 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন' এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড আলমগীর হোসেন দুলালের উপস্থিতিতে চাঁদপুর জেলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে কমরেড জিএম বাদশা এবং কমরেড আব্দুল ওয়াদুদ।

'কুয়েট শিক্ষার্থী অন্তর আত্মহত্যা একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড, এর দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে'– অন্তর আত্মহত্যার ঘটনায় প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের বিক্ষোভ

সারাদেশে নারীমুক্তি কেন্দ্রের সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। চট্টগ্রাম মহিলা কলেজে সদস্য সংগ্রহ করছেন নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার আহবায়ক আসমা আক্তার

শ্রমজীবী মানুষদের জন্য স্বল্প মূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু, সিন্ডিকেটের হাত থেকে দেশ ও সাধারণ মানুষকে রক্ষা, বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির পণ্য সহজলভ্য করার জন্য বিক্রয় কেন্দ্র ও পণ্য বাড়ানো, রোজায় মানুষদের ভোগান্তি কমাতে বাজার মনিটরিং করাসহ বিভিন্ন দাবীতে গত ১ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নগর সভাপতি রাজু আহমেদ এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কমরেড মানস নন্দী, ভজন বিশ্বাস প্রমুখ।

রংপুরে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন' এর বিক্ষোভ

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড পায়নি রংপুরের ভূমিহীনরা। জেলায় তারাই সবচেয়ে হতদরিদ্র অবস্থায় থাকলেও টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের তালিকায় তারা নেই। ফলে টিসিবির ফ্যামিলি কাড বরাদ্দ, রেশনের ব্যবস্থা করা ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে গত ২৭ মার্চ 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন' প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে রংপুরে। পরবর্তীতে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠনের নেতা চানমিয়ার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সদস্য সচিব আহসানুল আরেফিন তিতু, গোলজার হোসেন প্রমুখ।

বাসদ (মার্কসবাদী) রৌমারী উপজেলার উদ্যোগে ওএমএস ও টিসিবির মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বাড়ানো, কৃষি সেচে ব্যবহৃত ডিজেলের দামে ভর্তুকি, সরকার নির্ধারিত মূল্যে পর্যাপ্ত সার সরবরাহ, কালোবাজারি বন্ধ করা এবং বয়স্ক, বিধবা ভাতা ও ভিজিডি ভিজিএফসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুর্নীতি ও অবৈধ অর্থ আদায় বন্ধ করা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেশন ব্যবস্থা চালু করা সহ ৭ দফা দাবিতে মিছিল, সমাবেশ ও ইউ এন ও বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা কমরেড মহিউদ্দিন মহির, কৃষক নেতা জয়নাল আবেদীন ও আব্দুর রহিম, শ্রমিক নেতা রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে নতুন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ, চাকুরী স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধিসহ সাতদফা দাবিতে হরিজন অধিকার আদায় সংগঠন, রংপুর জেলার উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল, সোমবার বেলা ১২টায় মেয়রের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সাম্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও আধিপত্য বিস্তারের লড়াই

বা গায়ের জোরে প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টির দিকে এগিয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক শিবির অবলুপ্ত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধের বিপদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা তথাকথিত একমেরু বিশ্বের সুযোগ নিয়ে একের পর এক আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে নানা অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি, লুণ্ঠন, হত্যা এবং অবাধ ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। পুর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের পর তাদের উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্ববাজারে আমেরিকা এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভুত হয়েছে। আজ রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিন সম্পূর্ণরূপে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নায়ক। তিনি রাশিয়ার অভ্যন্তরে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এবং সিআইএস রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাশিয়ান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধোন্মাদনা এবং 'মহান রুশ আত্মগরিমা' সৃষ্টির পথে হাঁটছেন। সেজন্য কৌশলে স্ট্যালিনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিজয়ের গৌরবকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন।

যুদ্ধই পুঁজিবাদের একমাত্র বাঁচার পথ

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে বড় প্রতিবেশীর পাশে থাকা ছোট দেশগুলো এখন আরও সতর্ক হবে, অস্ত্র কেনায় মন দেবে। ইউক্রেনে যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলুক বা দ্রুত শেষ হোক, রাশিয়ার ঘটানো এ 'সর্বনাশ' সামনে নিশ্চিতভাবেই অস্ত্র ব্যবসার বাজার রমরমা হবে।

আজ বিশ্বপুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায়। বড় বড় কোম্পানিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছে। সর্বোচ্চ মুনাফার পুঁজিবাদী অর্থনীতির কারণে অনেক দেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে আজ গৃহহীন, কর্মহীন লোকের ভীড় বাড়ছে। কোন অবস্থায়ই এই সংকট তারা কাটিয়ে উঠতে পারছেনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদের যে বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে সংকটের মধ্যেও পুঁজিবাদের যে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব সেটা আজ আর নেই। আজ সে এবেলা-ওবেলায় সংকটে পড়ছে। ফলে সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য সে অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথে যাচ্ছে। রাষ্ট্র অস্ত্র কোম্পানিগুলো থেকে অস্ত্র কিনছে, সামরিক ব্যয় বাড়াচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে একটা কৃত্রিম তেজীভাব আসছে। আবার রাষ্ট্র অস্ত্র কিনে জমা করে রাখতে পারে না। তার অস্ত্র খালাস করা দরকার। সেজন্য সে আংশিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধ বাঁধাচ্ছে। এতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে ঠিক, কিন্তু এর উপর নির্ভর করেই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থনীতি টিকে আছে। ফলে 'অনন্ত যুদ্ধে' জড়িয়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার অর্থনীতির স্বার্থেই জরুরি।

সমাজতন্ত্রই বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি

আজ যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাজার দখলের লড়াই প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এই অবস্থায় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা একটা বাস্তব সম্ভাবনা হিসাবেই দেখা দিয়েছে। তবে এর বিরুদ্ধে কাজ করছে বিশ্বজুড়ে এবং আমেরিকার মতো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরেও যুদ্ধবিরোধী জনমতের শক্তি। ইউক্রেনের জনগণকে আজ বুঝতে হবে যে, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য তাদের শত্রু, রুশভাষী ইউক্রেনিয় শ্রমজীবী জনগণ নয়। দুপক্ষেরই আসল শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। রাশিয়ার আধিপত্যের পাল্টা হিসাবে আমেরিকার আধিপত্য কখনই কাম্য হতে পারে না। যে আমেরিকা আফগানিস্তান ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে, সেই আমেরিকার আধিপত্য অর্থাৎ ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নব্য নাৎসিবাদী ভাবাদর্শ ইউক্রেনিয়দের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না বরং সর্বাত্মক ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে। যারা একসময় এক দেশ হিসেবে লড়াই করে ফ্যাসিবাদকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলো, তারাই আজ দ্বিধাবিভক্ত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে, ফ্যাসিবাদী আদর্শকে সামনে আনছে–এটা হতে পারে না। ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে আমেরিকান ও রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বলি রাশিয়া ও ইউক্রেনের সাধারণ জনগণ হতে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে এইভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিভক্তি কোন সমাধান নয়, সমাধান বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা। সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকাকালে এইভাবে একদেশ আর এক দেশের উপর চাইলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো না। সমাজতান্ত্রিক শিবির তার শক্তি নিয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। এই উদাহরণ কম নেই। সমাজতন্ত্রই একমাত্র ব্যবস্থা যা এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও এর ফলাফলে বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে মুক্তি দিতে পারে। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি– ঘর থেকে শুরু বিশ্বব্যাপী। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই-ই এই মানবিক বিপর্যয় ও প্রাণহানি থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে।

'জান দেব তো ধান দেব না'

লোকসানে পড়ছে। অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সংসার চালাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক। ঋণ গ্রহণেও আছে ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র দাপট। স্থানীয় নেতাদের বখরা না দিলে মিলবে না সরকারি কৃষিঋণ। আবার চড়া সুদের মহাজনি ঋণের কারবারও করে উপরোক্ত ওই গোষ্ঠীই। স্থানীয় ভুমি অফিস, রেজিস্ট্রি অফিসেও এদেরই আধিপত্য। জোর করে গরীব, দুর্বল কৃষকের জমি দখল, খাস জমি দখলের মত ঘটনা ঘটছে অহরহ। ফলে ফ্যাসিবাদী শাসকের গ্রামীণ প্রতিনিধিদের কাছে গোটা দেশের কৃষক সমাজ জিম্মি। এ নির্মম নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে অভিনাথ, রবিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আর গোটা কৃষক সমাজ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে।

একদিকে স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ নিপীড়ন অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতি কৃষকদের জীবন বিপন্ন করছে। কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদি পণ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে দেশি-বিদেশি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে কৃষি উপকরণের মূল্য বাড়ছে প্রতিনিয়ত। অপরদিকে কৃষকের উৎপাদিত ফসল ক্রয়বিক্রয়ের সরকারি কোন ব্যবস্থাপনা না রেখে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের মুনাফার জন্য বাজার উন্মুক্ত করে

দিয়েছে। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কৃষককে ঠকিয়ে কম দামে ফসল কিনছে। ফলে কৃষক কৃষি উপকরণ কিনতে একবার ঠকছে আবার ফসল বিক্রি করতে আরেকবার ঠকছে।

ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই আদিবাসী কৃষকের আত্মহত্যা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রতিনিয়ত দেশের সাধারণ কৃষকের উপর রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের যে নিপীড়ণ চলছে তার বর্বরোচিত বহিঃপ্রকাশ এই ঘটনা। এই নিপীড়ণ থেকে পরিত্রাণ পাবার একটাই পথ। তা হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন। স্থানীয় স্বেচ্ছাচারী সেচ পাম্প নিয়ন্ত্রক, ফড়িয়া ব্যবসায়ী, আড়তদার, দালালদের বিরুদ্ধে যেমন জোট বাধতে হবে। একইসাথে কৃষি উপকরণ, উৎপাদিত ফসলের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ক্রয়-বিক্রয়ের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে হঠিয়ে কৃষি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণ কৃষক পঞ্চায়েতের হাতে নিতে হবে। বাংলাদেশের কৃষকদের সামনে পথ দুটি- এক. ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর নিপীড়ণ সহ্য করে ধুঁকে মরা; দুই. নিজের অধিকার আদায়ে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করা। অতীত ইতিহাস বলে এদেশের কৃষক সমাজ দ্বিতীয় পথই বেছে নেবে– তারা জান দেবে, তবু ধান দেবে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ্ এর উদ্যোগে গতকাল সকাল ১১ টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডক্টরস্ প্ল্যাটফর্ম ফর পিপলস্ হেলথ এর আহবায়ক ও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ডা. রশীদ ই মাহবুব। বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী, বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক সাইফুল হক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. দিবালোক সিংহ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. নাজমুস সাহার সাদিক, ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্টের সভাপতি ডা. আবু সাঈদ, জনস্বাস্থ্য সংগ্রাম পরিষদের

আহবায়ক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়জুল হাকিম লালা, অধ্যাপক ডা. হারুন উর রশীদ, হেলথ সার্ভিস ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ রচনা করেন ডা. এম এইচ ফারুকী, সেমিনারে সেটি পাঠ করেন ডা. গোলাম রব্বানী। সেমিনারটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. শাকিল আখতার। সেমিনারের মূল প্রবন্ধে দেশের জনস্বাস্থ্যের সংকটগুলো চিহ্নিত করা হয়। দেশের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, সুপেয় পানির বন্দোবস্ত নেই। শব্দ ও বায়ু দূষণ ক্রমেই বাড়ছে। ঢাকায় তা সবচেয়ে বেশি। সরকারের উন্নয়ন মডেল নিজেই জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কোন পরিকল্পনা নেই, গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার পর জনবান্ধব স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করা হয়নি কখনও, গ্রহণ করা হয়েছে ব্যবসাবান্ধব স্বাস্থ্যনীতি। এর কারণ স্বাধীনতার পর দেশটা শাসন করেছে পুঁজিপতিশ্রেণি। পাকিস্তানি ২২ কোটিপতি পরিবারকে দেশের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে উচ্ছেদ করেছিলো একটি শোষণ, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ পাবে বলে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫১ বছর পর আজ দেশে হাজার হাজার কোটিপতি সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতকে এই পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে জনস্বাস্থ্য বলে দেশে কিছু নেই। করোনা মহামারী এই নগ্নভাবে এই সত্য দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে, মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এই জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পেরেছিলো। ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। দেশ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চলছে, এর পরিবর্তন ব্যতিরেকে সবার জন্য স্বাস্থ্য তথা জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, বিপর্যস্ত জনজীবন

সংসারখরচ কি ভয়াবহ পরিমাণে বেড়েছে। এ সময়ের মধ্যে মোটা চালের কেজি ৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৮-৫০ টাকা, ৫৫ টাকা কেজি মোটা মসুর ডাল ১০০টাকা, সয়াবিন তেলের লিটার ১০৪ টাকা থেকে বেড়ে ১৬৮ টাকা, চিনির কেজি ৫১ টাকা থেকে ৮০-৮৫ টাকা, আটার কেজি ২৮ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সিপিজের জরিপে উঠে এসেছে, মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবারগুলো খাবারের ব্যয় কাঁটছাঁট করেছে ৪৩%। কিন্তু সরকারের কর্তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হবে, সব সরকারে নিয়ন্ত্রণে। পত্রিকায় এসেছে,"বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি অবশ্য জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির কারণে দেশে তেল, চিনি ও ডালের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। ফলে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কিছুই করার নেই। ভোজ্যতেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, 'ব্যবসায়ীরা তো আর বেশি টাকা দিয়ে পণ্য কিনে কম টাকায় বিক্রি করবে না। এখন আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমার অপেক্ষা করতে হবে।"(সাম্প্রতিক দেশকাল ৫ মার্চ, ২০২২)

এবারের দাম বৃদ্ধির কারণ কি? ব্যবসায়ীরা বলছেন, যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে দাম বাড়ছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, যেসব খাদ্যপণ্য যুদ্ধের আগে আমদানি হয়েছে বা দেশে উৎপাদিত হয়, সেগুলোর দাম বাড়বে কেন? খাদ্যমন্ত্রীই বলতে বাধ্য হয়েছেন,"বোরোতে বাম্পার ফলন হয়েছে, আমনেও হয়েছে, তারপরও চালের দাম বাড়ছে যা হাস্যকর।" (চালের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখছি : খাদ্যমন্ত্রী, বার্তা২৪ ডটকম, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২) জনগণ পরিষ্কার বোঝে ও জানে, এ মূল্যবৃদ্ধি একটা শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারসাজি এবং এ সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা আওয়ামীলীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ।

'ডয়চে ভেলে বাংলা'র রিপোর্ট বলছে,"বাংলাদেশে সয়াবিন তেল আমাদানি করা হয় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল থেকে। এখন বাজারে যে সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে তা আমদানি করা হয় গত ডিসেম্বরে। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টনের দাম ছিল হাজার ৪১১ ডলার। অন্যান্য খরচ ধরে সেই তেল প্রতি লিটার এখন ১৫২ টাকায় বিক্রি সম্ভব বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি দামে। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে ২০ লাখ টন ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে। ২০২১ সালে ২৭ লাখ ৭১ হাজার টন ভোজ্যতেল আমদানি হয়েছে। সে হিসেবে তেলের মজুত ও সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে। তারপরও বাজারে এখন সয়াবিন তেল স্বাভাবিক মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যারা আমদানিকারক, তারা তাদের নির্দিষ্ট ডিলারদের দিয়ে সয়াবিন তেল অবৈধভাবে মজুত করে এই সংকট তৈরি করছেন।" (তেল নিয়ে তেলেসমাতি ১১.৩.২০২২ ডয়চে ভেলে বাংলা) গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণত কুষ্টিয়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের ১২-১৫ জন বড় চালকল মালিক। একই এলাকার ৮-১০ টি পরিশোধন কারখানা নিয়ন্ত্রণ করে চিনির বাজার। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ ও বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড এ পাঁচটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে ভোজ্য তেলের বাজার। প্রশ্ন হলো, আওয়ামীলীগ সরকার এ সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করবে কি?

মজুতদারি বন্ধ করতে স্থগিত 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন' পুনরুজ্জীবিত করতে হবে

মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেশে কিছু আইন আছে। কিন্তু প্রয়োগ নেই। প্রতিযোগিতা আইনে বলা আছে, পণ্য বা সেবার ক্রয়বিক্রয়, মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করলে, উৎপাদন-সরবরাহ-বাজার সীমিত করলে তা প্রতিযোগিতার পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬ সালে প্রতিযোগিতা কমিশনও গঠিত হয়েছে। কিন্তু লোকবল নিয়োগ না দেয়ায়, সে কমিশন কার্যত ঢাল-তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দারের দশায় আছে। একসময় সরকারিভাবে ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী মজুদের সময়সীমা দেখার নিয়ম ছিল। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ১৯৯৯ সালে সেই সংস্থাটি বিলুপ্ত করা হয়। এখন আমদানিকারক বা পাইকারি ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য গুদামে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করতে পারে। মাঝে মাঝে লোকদেখানো ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার নাটক ছাড়া অবৈধ মজুতদারি নিয়ন্ত্রণের কোন পদক্ষেপ নেই। মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫৬ সালে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রনয়ণ করা হয়। এ আইন অনুসারে পাইকারী ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ ৩০ দিন ও খুচরা পর্যায়ে ১৫ দিনের বেশি ধান-চাল মজুদ রাখতে পারে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর প্রেসক্রিপশন ও তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির বড়ি গিলে এরশাদ সরকার ১৯৮৯ সালে খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ও ব্যবসায়ীদের মজুদ রাখা সংক্রান্ত এসআরও বাতিল করে। পরর্তীতে বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালে খাদ্যশস্যের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এরপর থেকেই খাদ্যশস্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। স্থগিত করা হয় 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন'। ২০১১সালে ও ২০১৬ সালে দুই দফায় স্থগিত 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন' সংশোধন করে পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলা হলেও, ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর আপত্তির মুখে আওয়ামীলীগ সরকার তা থেকে সরে আসে।

আওয়ামীলীগ সরকারের সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে একটা সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন,"একটা কথা হয় সিন্ডিকেট। আমি ১০ বছর মন্ত্রী ছিলাম। আসলে সিন্ডিকেট বলে কিছু আছে বলে আমি মনে করিনা। এটা একটা তথ্য সিন্ডিকেট। ব্যবসায়ীরা আমাদের বন্ধু। আজকের মিটিংয়েও আমি বলেছি, ধরপাকড়, জবরদস্তি করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়না। সবাইকে আপন করে নিয়ে সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে সমস্যার সমাধান করব।"(বার্তা'২৪,১ ডিসেম্বর,২০১৯) সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের বক্তব্যেই স্পষ্ট, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিলেও, কেন সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেনা। তারা 'সরকারের বন্ধু। টিআইবির রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে সংসদের ৬১ শতাংশই ব্যবসায়ী। অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনসমর্থনহীন আওয়ামীলীগ সরকার ব্যবসায়ীদের তুষ্ট রাখতে চায়। ব্যবসায়ীরা জানে সরকার কোন কড়া পদক্ষেপ নেবেনা, বাজার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত হাঁকডাক আমজনতাকে শান্ত রাখার জন্য।

টিসিবি ও ফ্যামিলি কার্ড

সরকার গরীব- নিম্নবিত্তদের জন্য টিসিবির মাধ্যমে ১ কোটি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করছে। ঢাকা ব্যতীত সারাদেশে এ ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, যা দিয়ে তারা শুধু রোজার মাসে দুইবার পণ্য কিনতে পারবেন। এই পণ্যগুলো প্যাকেজে কিনতে হবে। অর্থাৎ কেউ প্রয়োজনে আলাদাভাবে তেল, ডাল ইত্যাদি কিনতে পারবেন না, কিনলে পুরো প্যাকেজই কিনতে হবে। ইতোমধ্যেই এ ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে দেশজুড়ে। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, ছোলা, চিনি ইত্যাদি কম মূল্যে দেওয়া হলেও, বাজারে এসব পণ্যের দাম কমেনি। কমার কথাও নয়। কারণ যে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও ভোগ্যপণ্য ব্যবসায়ী যে বড় গ্রুপগুলো (বসুন্ধরা, সিটি গ্রুপ, মেঘনা, সেনা কল্যাণ সংস্থা ইত্যাদি) বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের কাছ থেকেই টিসিবি ফ্যামিলি কার্ডের পণ্য কিনেছে। সরকার যদি টিসিবিকে দিয়ে একই পণ্য সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানি করতো, তাহলে তা দেশের বাজারে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের প্রভাব কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা ভুমিকা রাখতে পারতো। কেন সরকার এ উদ্যোগ নিলনা? উত্তর সহজ। সরকার ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকেও খুশি রাখতে চায়, আর মানুষকেও দেখাতে চায়, সরকার কত জনবান্ধব। টিসিবির (ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ) মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের দাবি করলেও, টিসিবির সে সক্ষমতাই তৈরি করা হয়নি। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সাংবাদিকদের বলেছেন,"টিসিবি অর্থনীতির মেরুদণ্ড। টিসিবিকে আরও কার্যকর করে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে টিসিবিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সংস্থাকে সক্রিয় করার ফলে যারা সিন্ডিকেট করে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের সে সুযোগ দেওয়া হবে না। টিসিবিকে কার্যকর করে সাধারণ ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দিতে পারলে দাম বাড়ানোর সুযোগ থাকবে না।"

মাত্র ২৭৫ জন জনবল, ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা-রাজশাহী এ চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়, মাত্র ৬ হাজার ৮৪০ টন ধারণক্ষমতার পণ্যগুদাম ও সারা দেশের কোটি কোটি মানুষের জন্য মাত্র ৪০০ ট্রাকে অল্প কিছু পণ্য বিক্রি করে কিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব? বাংলাদেশে ইউনিয়ন আছে সাড়ে চার হাজার। তার বাইরে আছে অনেকগুলো পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন। প্রতি ইউনিয়নে ন্যূনতম একটি এবং জনসংখ্যা অনুযায়ী পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে ট্রাক রাখতে চাইলে ট্রাকের প্রয়োজন হতো অন্তত ৬ হাজার। ভোগ্যপণ্যের বড় অংশ আমদানিনির্ভর, যা ব্যবসায়ী-রা নিয়ন্ত্রণ করে। টিসিবি দেশের মোট আমদানির মাত্র ০.৩০ ভাগ আমদানি করে। এ যেন সাগরে একবিন্দু জলের মতো। টিসিবি যে আমদানি করবে, সে অর্থ বরাদ্দই সরকার করছেনা। টিসিবির অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করে সংসদে বিল পাশ হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু এখনও সে অর্থ বরাদ্দ হয়নি। ফলে টিসিবির ট্রাকসেল বা বর্তমান ধরণের ফ্যামিলি কার্ড বর্তমান সংকট কাটাতে সমাধান নয়।

সর্বজনীন রেশনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন আজ সময়ের দাবি

তাই মুনাফালোভী ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও অসাধু সিন্ডিকেটের হাত থেকে সীমিত ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষকে কিছুটা বাঁচাতে হলে আজ প্রয়োজন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষত চাল, ডাল, আটা, খাবার তেল, চিনি, পেঁয়াজের মতো খাদ্যদ্রব্যের গণবন্টনব্যবস্থা বা রেশনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। নব্বই দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে রেশনিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ ঠেকাতেই ১৯৪৩ সাল থেকে ভারতবর্ষে রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশেও চালু ছিল। ১৯৭২ সালে দেশের চারটি প্রধান শহরে অগ্রাধিকার গ্রুপে বিধিবদ্ধ রেশনিং (ঝঃধঃঃড়ু জবঃরড়হরহম-ঝজ) ব্যবস্থা চালু ছিল। এ চারটি শহর হচ্ছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা। ১৯৭৩ সালে রাজশাহীকে এবং ১৯৭৬ সালে রাঙ্গামাটিকে 'এস আর' এর আওতায় আনা হয়। এই ছয়টি শহরের সকল বাসিন্দা এবং অগ্রাধিকার গ্রুপ প্রতি সপ্তাহে একবার করে মাসে চারবার রেশন পেতেন। নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত রেশন ডিলারের কাছ থেকে তারা রেশন তুলতেন। কম দামে কার্ডধারীরা চাল, ডাল, তেল, লবণ, গম, চিনি, ঘি ইত্যাদি পেতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি একটি রেশন কার্ড পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। এর বাইরে কতিপয় অগ্রাধিকার গ্রুপকে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় রেশন সরবরাহ বাধ্যতামূলক হয়। এদের মধ্যে আছে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, রাষ্ট্র পরিচালিত হাসপাতাল, কারাগার এবং ছাত্রাবাস। বিধিবদ্ধ রেশনিং (এস আর) এলাকাভুক্ত ছয়টি শহরের বাইরে অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে চালু ছিল সংশোধিত রেশনিং (Modified Retioning-MR) ব্যবস্থা। এতে সব পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক ও সরকারি খাতের শ্রমিকদের রেশনের পুরো কোটা সরবরাহ করা হয়। নব্বই দশক হতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে চাপ দিতে থাকে। বাজার মুক্ত করতে হবে, বাজারে রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ চলবেনা, কোন জিনিস কী দামে বিক্রি হবে বাজারই তা ঠিক করবে, আমদানি-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা যাবেনা, রেশনে দুর্নীতি হয় ফলে রেশনব্যবস্থা তুলে দিতে হবে– এই ছিলো তাদেও প্রেসক্রিপশন। এই প্রেসক্রিপশনে তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালে খাদ্যে রেশনিং ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলো। মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিলুপ্ত ও টিসিবির কার্যক্রম একেবারে গুটিয়ে নেয়া হয়। পরবর্তী সরকারগুলো এ দাওয়াই বাস্তবায়ন বহাল রাখে। খাদ্যপণ্য আমদানির উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। এর ফল হলো, বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠে গিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলো। এখন তাদের ইশারাতেই বাজার উঠবস করে। সাধারণ মানুষের রেশন তুলে দেওয়া হলেও আর্মি, পুলিশ, বিজিবি, আনসার, কারারক্ষী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মচারীরা রেশন সুবিধা পেয়ে থাকে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা রেশন সুবিধা ভোগ করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পুলিশ সদস্যরা রেশন হিসেবে চাল, ডাল, তেল, আটা ও চিনি পেয়ে থাকেন। প্রতি মাসে পুলিশের সব সদস্য প্রতি কেজি চাল ২ টাকা ১০ পয়সা এবং প্রতি কেজি গম ১ টাকা ৭৭ পয়সা দরে রেশন হিসেবে পান। আনসার, কারারক্ষী, ফায়ার সার্ভিস ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীরাও একই দরে চাল ও গম উত্তোলন করেন। বিজিবি সদস্যরা প্রতি কেজি ২ টাকা ৫৫ পয়সা দরে চাল ও ২ টাকা ১৫ পয়সা দরে গম উত্তোলন করেন। স্বামী-স্ত্রী, এক সন্তানসহ কারও পরিবারের তিন সদস্য হলে মাসে ৩০ কেজি চাল, ২৫ কেজি আটা, ৭ কেজি ডাল, ৬ লিটার তেল ও ৪ কেজি চিনি পেয়ে থাকেন। কারও পরিবারের সদস্য স্বামী-স্ত্রীসহ চারজন হলে প্রতি মাসে ৩৫ কেজি চাল, ৩০ কেজি আটা, ৮ কেজি ডাল, ৮ লিটার তেল ও ৫ কেজি চিনি পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে তুলে দেওয়া হলেও, ভারতে গণরেশন ব্যবস্থা সফলতার সাথে চালু আছে। ভারতীয় জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (২০১৩) বা এনএসএফ এর মাধ্যমে গ্রামের ৭৫ শতাংশ এবং শহরের ৫০ শতাংশ নাগরিকের জন্য এটাকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক মৌলিক অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। এনএসএফ কার্ডধারীর সংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি ৭৫ লাখ, যার আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি ভারতে রেশনের দোকান বা ফেয়ার প্রাইস শপের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ এই রেশনের কার্ড দেখিয়ে রেশনের দোকান থেকে অতিদ্ররিদ্ররা প্রতি মাসে ৩৫ কেজি এবং অগ্রাধিকারভুক্তরা পরিবারের সদস্যপিছু ৫ কেজি করে চাল-আটা যথাক্রমে ২ ও ৩ টাকা কেজি দরে ক্রয় করতে পারে। শুধু তাই নয়, এইসব রেশনের দোকানে রেশন কার্ড ধারীদের কাছে বাজার মূল্যের অর্ধেক দরে তেল, চিনি, ময়দাসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও বিক্রি করা হয়। (বাংলাদেশে টিসিবি ট্রাক বনাম ভারতীয় রেশনব্যবস্থা-কল্লোল মোস্তফা ২ এপ্রিল, ২০২২, দৈনিক সমকাল)। ভারতে রেশনব্যবস্থা ডিজিলাইজেশন করার ফলে রেশনকার্ড নিয়ে দুর্নীতির সুযোগও কমে এসেছে। ভারত যদি রেশনব্যবস্থা চালু রাখতে পারে, বাংলাদেশ কেন রেশনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে পারবেনা?

খাদ্যপণ্যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু কর

দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে জিনিসপত্র উৎপাদন হয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়, পুঁজিবাদী দেশে তেমন হয়না। জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, সর্বোচ্চ মুনাফার জন্যই এখানে উৎপাদন নীতি ও উৎপাদন পরিচালিত হয়। ফলে মূল্যবৃদ্ধি পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। মালিকের শোষণের ফলে শ্রমিকসহ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। আয়ের সাথে ব্যয়ের তাল মেলাতে না পারায়, জনগণের নাভিশ্বাস উঠে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে, মূল্যবৃদ্ধির সংকট হতে সাধারণ মানুষের নিস্তার নেই। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও সরকার মূল্যবৃদ্ধি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এ দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারেনা। খাদ্যদ্রব্য যাতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে,তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। ব্যবসায়ীরা যাতে মজুতই করতে না পারে, তার বাস্তব অবস্থা তৈরি করা।তা করতে হলে চাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে অন্ততঃ খাদ্যের ক্ষেত্রে পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবসা চালু করা। আমাদের দেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, আমদানি, সরবরাহ ও বন্টনের পুরো ব্যবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা। কৃষক অল্প দামে পাইকার, আড়তদার, হিমাগার মালিক, চালকল মালিক, ফড়িয়া এ ধরণের মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কৃষক ন্যায্যমূল্য পায়না এবং অতিরিক্ত দামে জনগণকে তা কিনতে হয়। যেসব খাদ্যপণ্য আমদানিনির্ভর, তার দামও নির্ভর করে আমদানিকারকদের উপর। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির আঘাত পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু খাদ্যপণ্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ হতে ন্যায্যমূল্যে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র, এজেন্সির মাধ্যমে খাদ্যশস্য কিনে নিবে এবং যেক্ষেত্রে প্রয়োজন বিদেশ থেকে আমদানি করবে এবং সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলে সে খাদ্যশস্য বিভিন্ন সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করবে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছোমতো কম দামে কৃষকদের কাছ হতে খাদ্যশস্য কিনতে পারবেনা, ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে দিতে পারবেনা। এর ফলে একদিকে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে, অন্যদিকে জনগণ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হতে রেহাই পাবে।

প্রশ্ন হলো 'ব্যবসায়ীদের বন্ধু সরকার' কি তা করবে? ব্যবসায়ীদের সমর্থনে সে টিকে আছে, তারা নাখোশ হবে,এমন পদক্ষেপ কি গ্রহণ করবে? যে সমাজে উৎপাদনের লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, সেখানে তীব্র গণআন্দোলন না থাকলে মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া হতে বাধ্য। এজন্যই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়,সেজন্য চায় ভুক্তভোগী জনগণের সংগঠিত গণআন্দোলন।বাঁচতে হলে সে আন্দোলনে আজ সবাইকে সামিল হতে হবে।

সূত্র: ১.বাংলাদেশে টিসিবি ট্রাক বনাম ভারতীয় রেশনব্যবস্থা-কল্লোল মোস্তফা (২ এপ্রিল, ২০২২, দৈনিক সমকাল)
২.সাপ্তাহিক গণদাবী

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২২

‘জান দেব তো ধান দেব না’

জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে ফসলের ন্যায্য পাওনা আদায়ে এদেশের কৃষক গড়ে তুলেছিল ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন। সেদিন কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল-

জান কবুল আর মান কবুল,
আর দেব না আর দেব না রক্তে বোনা ধান,
মোদের প্রাণ হো....

আজও কৃষকের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাঠে ফলে সোনালী ধান। প্রতিদিন যত্নে সন্তানের মত করে রক্ষা করে বন্যা, খড়া, ঝড়ের কবল থেকে। তাই ধান মোদের প্রাণ। জান থাকতে ধান দেব না। তেভাগা আন্দোলনের পর আমরা দুইবার স্বাধীনতা উদযাপন করেছি। একবার বৃটিশদের হাত থেকে, একবার পাকিস্তানের হাত থেকে। কিন্তু এখনও আমাদের ধান রক্ষায় জান কোরবান করতে হচ্ছে। গত ২৩ মার্চ রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার নিমবটু গ্রামের দুই আদিবাসী ভাই ধান রক্ষা করতে না পেরে আত্মাহুতি দিলেন। কেন? কারণ তারা গরীব, তারা আদিবাসী। দিনের পর দিনওবরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন সেচ প্রকল্পের ঐ অঞ্চলের অপারেটর এলাকার কৃষকলীগ নেতা শাখাওয়াতের কাছে ধরনা দিয়ে তাদের জমিতে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে নি। অভিনাথ মার্ডি আর রবি মার্ডি ফরিয়াদ করেছিল পানি না দিলে ধান ফলবে না, ধান না ফললে পরিবারসহ না খেয়ে মরতে হবে। যদি তাদের জমিতে পানি না দেয়া হয় তাহলে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে তারা আত্মহত্যা করবে। এদেশের ভূমিপুত্ররা তাদের কথা রেখেছে। রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদের ক্ষুদ্র প্রতিনিধি কৃষকলীগ নেতা শাখাওয়াতের কর্তৃত্বাধীন গভীর নলকূপের পাশে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। এ সংবাদ প্রচারের পর বিবেকবান মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ফলে মামলা গ্রহণ, কতৃপক্ষের তদন্ত কমিটি গঠন, অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা বলে এই ঘটনার আলোচনা একটু স্তিমিত হয়ে গেলে অপরাধী তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মুক্তি পাবে, তদন্ত হিমাগারে চলে যাবে। আর আজীবন দুঃখের সঙ্গী হয়ে দিন কাটাবে অভিনাথ, রবির পরিবার। এভাবে দুই আদিবাসী কৃষকের আত্মহত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনা আড়ালে চলে যাবে কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গরীব, ক্ষমতাহীন কৃষকের উপর নিপীড়ন চলতেই থাকবে। কারণ জমিতে পানি না পাওয়ার ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অভিনাথ, রবি হয়ত জীবন দিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অভিনাথ ধুঁকে ধুঁকে মরছে প্রতিনিয়ত। ধান চাষের প্রধান অবলম্বন পানি। পানি সেচের উৎস ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ চালিত পাম্প, ডিজেল চালিত পাম্প, সরকারি বিভিন্ন সেচ প্রকল্প এবং প্রাকৃতিক উৎস। ব্যক্তি মালিকানার সেচ পাম্প মূলত ধনী কৃষকের এবং সরকারি প্রকল্পের ডিলার বা অপারেটরও হয় ধনী কৃষক এবং অতি অবশ্যই ক্ষমতাসীন দল সম্পৃক্ত লোকজন। ফলে গোটা দেশের সেচ ব্যবস্থা প্রধানত ধনী এবং ক্ষমতা সম্পৃক্ত লোকজনের দখলে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে দমন-পীড়ণের ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। উন্নয়নের নামে যথেচ্ছ লুটপাট করছে। স্বাভাবিকভাবে তার প্রভাব গ্রামে কৃষিক্ষেত্রেও পড়ছে। সেচ পাম্পের মালিক বা ডিলাররা ক্ষমতাসীন দল সম্পৃক্ত হওয়ায় কৃষকদের জিম্মি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, নিজেদের খেয়াল-খুশিমত পানি দেয়া, নানা দুর্নীতি করছে অবাধে। সাধারণ কৃষকরা অসহায়। দেশের অধিকাংশ এলাকায় বিশেষত উত্তরবঙ্গে যেখানে পানির সংকট প্রবল সেখানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের প্রায় দুই/তিনগুণ অর্থ আদায় করা হয়। যার ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। কিন্তু ফসলের মূল্য তো বাড়ছে না। কারণ ফসল বিক্রিতেও এই ক্ষমতাসীন সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় এবং জাতীয় বাজার। কোন এলাকায় সাধারণ কৃষক সরকার নির্ধারিত মূল্যে গোডাউনে ধান বিক্রি করতে পারে না। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা অথবা আড়তদার ফড়িয়ারা কৃষকের নিকট থেকে কম দামে ধান কিনে সরকারি গোডাউন বা চাতাল মালিকদের কাছে বিক্রি করে। ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল, সবজি, ফল সবকিছুর বাজার এখন স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণে। এভাবে সাধারণ কৃষকদের জিম্মি করে রেখেছে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী। ফলে কৃষক প্রতিনিয়ত

● ৬ এর পাতায় দেখুন

অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, বিপর্যস্ত জনজীবন

মানুষের গলা টিপে বৃহৎ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের মুনাফাবৃদ্ধি

মেহের নিগার, ৭০ বছরের বৃদ্ধা। কাঠফাঁটা রোদে সকাল থেকে ৪ ঘন্টা ধরে টিসিবির লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঢাকার পল্লবীতে টিসিবির ওএমএস ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন পাঁচ কেজি মোটা চাল কিনবেন বলে। ছেলে একটি স্কুলের দারোয়ান। ছেলের বউ অনেকদিন ধরে অসুস্থ। নাতি দুটো ছোট। তাই বৃদ্ধ বয়সেও সংসার খরচ বাঁচাতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন,“এখন যে অবস্থা, সংসার আর চলে না। সকালে সবাই পানিভাত লবণ দিয়া কছলাইয়্যা খাইছি। রাতে ২০ টাকার ইচা মাছ কিনে ভাউত্যা শাক দিয়ে রান্না হয়। অনেক দিন ধরেই হাক-পাতা খেয়ে আছি। পাঁচ কেজি চাল বাজারে কিনতে ৩০০ টাকার মতো লাগে। ট্রাক থেকে কিনলে ১৫০ টাকার মতো বেঁচে যায়। গরিবের জন্য এটা কম কিসে। গায়ে জোর থাকলে আমিও কাজ করতাম। সেই জোর তো আর নাই।’

মগবাজারের গাবতলায় সড়কের পাশে ছোট্ট চায়ের দোকান চালান নান্নু মিয়া। দিনে তার আয় পাঁচ-ছয়শ টাকা। তিন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। থাকেন মগবাজার পেয়ারাবাগে, একটি টিনের ঘরে। ভাড়া ছয় হাজার টাকা। বড় অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছেন। সংবাদকর্মী পরিচয় দিয়ে আয় ও সংসার খরচ বিষয়ে প্রশ্ন করতেই একটু বিরক্তবোধ করলেন। প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, “এই ছোট্ট চা দোকান দিয়ে কোনোরকমে সংসার চালিয়ে আসছিলাম। কয়েক মাসে চাল, তেল, পেঁয়াজ, তরকারির দাম যেভাবে বেড়েছে, তাতে সংসার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ডাল-আলুই চলছে বাসায়। কখনও ডিমভাজি থাকে। মাছ-মাংস প্রসঙ্গ তুললে বলেন, “এগুলো আমার কাছে সোনার হরিণের মতো।”

সমকাল পত্রিকায় গত ১৭ মার্চ প্রকাশিত ‘জীবন সংসার এখন গলার কাঁটা’ শিরোনামের রিপোর্টে এভাবেই মূল্যবৃদ্ধিতে অসহায় মানুষের কান্না উঠে এসেছে। করোনা মহামারীর কারণে আয় ও সঞ্চয় কমে যাওয়াসহ যে আর্থিক ধাক্কা, তা এখনও বেশিরভাগ মানুষ পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর মধ্যে সমস্ত কিছুর মূল্যবৃদ্ধি এ মানুষদের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। টিসিবি ট্রাকের সামনে নিম্নবিত্ত ও সম্প্রতি মধ্যবিত্তদের বাড়তে থাকা ভীড়, পণ্য পেতে মানুষের দীর্ঘ অপেক্ষা ও মরিয়া চেষ্টা, না পেয়ে কান্না-পরিস্থিতির ভয়াবহতাকেই নির্দেশ করে।

২০১৯ সালের জানুয়ারি ও ২০২২ সালের এপ্রিলের বাজারদর পাশাপাশি রাখলে বোঝা যাবে,

● ৭ এর পাতায় দেখুন

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও আধিপত্য বিস্তারের লড়াই প্রাণ ও মূল্য দিচ্ছে সাধারণ মানুষ

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ উন্মাদনা ও অর্থনৈতিক সংকট বাড়িয়েছে। রাশিয়ার তেল রপ্তানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে তেলের দাম দ্রুতগতিতে বাড়ছে। রাশিয়ার শস্য ও সার রপ্তানী বন্ধ হলে বিশ্ববাজারে এসব পণ্যের দামও বাড়বে। তেল ও সার আমদানির ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের কৃষকসহ দুনিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে মুনাফা বাড়বে অস্ত্রব্যবসায়ী, তেল কোম্পানি ও ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের। জার্মানী সামরিক বাজেট বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে, একই পথ অনুসরণ করবে আরো দেশ। কোভিড মহামারীতে ৫০ লক্ষাধিক মৃত্যু ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সামরিক ব্যয় কমিয়ে স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিক গবেষণা-জনকল্যাণে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি উঠেছিল বিশ্বব্যাপী, বাস্তবে ঘটছে উল্টোটা। কিন্তু কেন এই যুদ্ধ, কারা এর জন্য দায়ী, সমাধান কোন্ পথে?

রাশিয়ার দাবি – ১. ইউক্রেন আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিক জোটে যোগ দেবার পরিকল্পনা স্থায়ীভাবে ত্যাগ করে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করুক; ২. ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় রুশভাষী জনগণের ওপর নির্যাতন-সামরিক হামলা বন্ধ করুক এবং সেখানকার জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ডোনেটস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে নিক; ৩. ইউক্রেনের সরকার, সেনাবাহিনী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মিশে থাকা রুশবিদ্বেষী নব্য নাৎসীবাদীদের নির্মূল করুক।

এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে বর্তমান সংকটের প্রেক্ষাপট ও কার্যকারণ

● ৩ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত। ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩।
ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org